Belles-Lettre 2023, Vol. 1, pp. 203-210

ঔচিত্যভাবনায় কাব্যশাস্ত্রের প্রাসঙ্গিকতা

প্রবালি দাস

শব্দ ও অর্থের সমন্বয়ে গঠিত বাক্য শরীরকে কাব্যের মর্যাদায় ভূষিত করতে গেলে তার শোভা বর্ধনের জন্য রস, গুন ও অলংকারাদির বিশেষ প্রয়োজন। কাব্যের এই সৌন্দর্য-পরায়ণতাই কাব্যকে অনেক বেশি মহিমান্বিত করে তোলে। কাব্য সৃষ্টিতে কোথায় কখন কাব্যের মধ্যে রসের সঞ্চার ঘটাতে হবে এবং কোথায় অলংকারের সৌন্দর্য প্রকাশিত করতে হবে সমস্ত বিষয়ের সঠিক প্রয়োগ না করতে পারলে তা কাব্য পদমর্যাদার তুল্য হয়ে ওঠে না। আর এই সকল বিষয়ের প্রয়োগের সুনিপুণতার অন্তর্নিহিত ভাবাবেগ প্রতিস্থাপন করতে সহযোগিতা করে ঔচিত্য। ঔচিত্যবোধের সমন্বয়েই কাব্যের গুণমান সহৃদয় পাঠকের কাছে অনেক বেশি সমাদৃত হয়ে ওঠে। তাই বলা হয় -

> শব্দ যেখানে অর্থ হাতে অধিকতর মনোজ্ঞ, সেখানে শব্দই প্রধান। অর্থ যেখানে শব্দঝংকার হইতে অধিকতর চমৎকারী, সেখানে অর্থই প্রধান।কিন্তু এই উভয় ক্ষেত্রে প্রকৃত সাহিত্যের লক্ষণ স্বীকার করা যায় কিনা, তাহা লইয়া সমালোচকগণের মধ্যে বিবাদের অন্তত নাই। [১]

ঔচিত্য অর্থাৎ উচিত বোধের বিকাশ ও যখন যা উচিত সেই বিষয়েকে যথোপযুক্ত সময় যথা ভাবে প্রয়োগের কৌশল তাকে কাজে লাগিয়ে তাকে কাব্য শরীরের অঙ্গ সৌন্দর্যের পরিবর্তিত করে তুলতে সহযোগিতা করে। এই ঔচিত্যবোধের বিকাশ এবং তার প্রয়োগের ক্ষেত্রে যথাযোগ্য নাহলে কাব্যের সৌন্দর্য ও কাব্যশৈলী কোনটাই কুশল হয়ে ওঠে না। তাই কাব্য রচনায় ঔচিত্যের সুনিপুণ ব্যবহারিক ও তার প্রয়োগ ক্ষেত্র সম্পর্কে অবশ্যই অবগত হতে হয়। ঔচিত্য বোধের এই ভাবধারা এবং তার প্রয়োগের সুনিপুণতাই কাব্যকে নতুন পথে পরিচালিত করতে সহযোগিতা করে, ও পরিশেষে এ কথা বলা যায় যে পাঠক সমাজের হৃদয়ে কাব্যের আস্বাদন হৃদয়স্পর্শী

অতিথি অধ্যাপক,বাংলা বিভাগ (দুর-শিক্ষা), চাপড়া বাঙ্গালঝি মহাবিদ্যালয়, নদিয়া

হয়ে ওঠে- 'কাব্যানুশীলনের অভ্যাসবশে যে সকল পাঠকদের মনোবৃত্তি নির্মল আদর্শের ন্যায় স্বচ্ছতা লাভ করিয়াছে এবং যাহারা কবিবর্নিত কাব্যবস্তুর সহিত নিজ নিজ চিত্তবৃত্তিকে অভিন্ন করিয়া তুলিবার যোগ্যতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই সহৃদয়।' [২]

কবির সৃষ্টি কাব্য। এই কাব্য সৃষ্টি ভারতীয় পরম্পরাক্রমে আজও ধারাবাহিক ভাবে চর্চিত হয়ে চলেছে। রামায়ণ মহাভারত মহাকাব্যদ্বয়কে অবলম্বন করে এবং সেই ভাবধারাকে আশ্রয় করে কাব্যরচনার অন্যতম উপাদান হিসাবে অনেক কাব্য রচিত হয়েছে। কবির রচনাকে কাব্য হিসাবে গ্রহণ করাটা সর্বাঙ্গীন ভাবে কতটা যুক্তিযুক্ত সেটা কিন্তু বিচার্য বিষয়, কেননা কোন কিছু রচনা হলেই যে তাকে কাব্য পদমর্যাদায় অভিভূত করা হবে তা কিন্তু নয়। সেই কাব্যের মধ্যে প্রাণ আছে কি না অর্থাৎ কাব্য-প্রাণ আছে কি না এটা বিবেচ্য বিষয়। তাই বলতে হয়-

শব্দাত্মক সাহিত্যের স্বরূপ বিচারের ক্ষেত্রে ও তূষ্ণীম্ভাবই শেষ পর্যন্ত বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক।সত্য বটে, কাব্যের শরীররূপী শব্দ, ছন্দঃ, অলঙ্কার, রীতি,গুণ ,- এই সকল উপাদান পৃথকভাবে বিশ্লিষ্ট করিয়া লইলে, কাব্যবস্তুর উপলব্ধি গোচর আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। [৩]

কাব্যপ্রাণ বলতে কাব্য রস, অলংকার, গুন ইত্যাদি। কাব্যের মধ্যে যদি উপযুক্ত ও যথাযথ শব্দ,বাক্য, অলংকার ইত্যাদি প্রয়োগ নাই হয়,তাহলে তাকে কাব্য বলা যায় না।তাই কাব্যের মধ্যে উচিত এবং অনুচিত বিষয়ের প্রয়োগকে কেন্দ্র করেই ঔচিত্যের জন্ম। কাব্যের এই ঔচিত্য কাব্যকে বলে দেয় কাব্য কতটা হৃদয়গ্রাহী। যে কাব্যে শব্দ, গুণ, অলংকার, রস ইত্যাদি যথাযথ ভাবে প্রয়োগ হয় সেই কাব্যই ততবেশি হৃদয়গ্রাহী হয়ে ওঠে। এই সমস্ত কিছু কাব্যসৌন্দর্যের সঙ্গে ওতপ্রতভাবে যুক্ত রয়েছে ঔচিত্য। তাই কাব্যকে আরো বেশি সুন্দর করে তুলতে এই সমস্ত কাব্যিক বিষয়গুলি অবশ্যই আমাদের দৃষ্টিপাত করা উচিত তাহলেই একটা কাব্যকে যথাযথ কাব্য মর্যাদায় ভূষিত করা হবে। অর্থাৎ এই ঔচিত্য হলো কাব্যসৌন্দর্যের অন্যতম মাপকাঠি এবং কাব্যের প্রাণ ও বটে। তাই কাব্যশাস্ত্রের ভাবনায় ঔচিত্যের প্রাসঙ্গিকতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বিবেকশীল জীব হলো মানুষ। মানুষের কৃতকর্মের পরিধি অপরিসীম। মানুষের ব্যক্তিকেন্দ্রিক ভালোলাগা থেকেই তার কর্মক্ষেত্রের সূচনা হয়। যখন কোন ব্যক্তির এই ভালোলাগা কর্মের মধ্যে কাব্যসৃষ্টির তথা কাব্যরচনামূলক কর্মের প্রতি নিজেকে নিযুক্ত করেন তখন তার কর্ম কাব্যমুখী হয়ে ওঠে। এই জগত সৃষ্টির সাথে কাব্য সৃষ্টির অপরূপ মেয়ে থাকলে ও কাব্যসৃষ্টি কিন্তু কোন বাঁধাধরা নিয়মের মধ্যে নয়,

তবুও কাব্যরচনার ক্ষেত্রে বিশেষ কতগুলো বিষয়ের প্রতি অবশ্যই দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন। যে বিষয়গুলোকে কাব্যের মধ্যে প্রয়োগ না করলে কাব্য একটা প্রাণহীন শরীরের মতন হয়ে যায়। যে মানুষের মধ্যে কোন প্রাণ নেই সেই মানুষকে আপাতদৃষ্টিতে মানুষের মতো দেখতে হলেও সে কিন্তু একটা চৈতন্যময় মানুষ হিসাবে তাকে আর আমরা গ্রহণ করতে পারি না, তদ্রুপ কাব্যের মধ্যে যদি সেই কাব্যের প্রাণ না থাকে তাহলেও তাকে কিন্তু সেই কাব্যমর্যাদায় তাকে গ্রহন করা যায় না। অর্থাৎ কাব্যকে প্রাণময় করে তুলতে আমাদেরকে অবশ্যই ঔচিত্যের কথা মাথায় রাখতে হয়। অর্থাৎ কাব্যে কোথায়, কখন কাব্যের অলংকার, গুণ, রস ইত্যাদি প্রয়োগ করতে হবে এই সামঞ্জস্যপূর্ণ বোধ যদি কবির মধ্যে না থাকে তাহলে সেই কাব্য প্রাণহীন কাব্যের সমান হবে। তাই তো বলা হয়েছে -

> শরীরের লাবণ্য যেমন শরীরের অবয়ব হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন অথচ তাহা অবয়বের দ্বারাই প্রকাশিত হয় এবং কোন অলঙ্কারাদির অপেক্ষা রাখে না, ধ্বনি ও সেইরূপ কাব্যশরীরের মধ্য দিয়া অভিব্যক্ত হয় অথচ কাব্যশরীর হইতে একান্ত স্বতন্ত্র। [৪]

কবির মধ্যে অবশ্যই এই বিষয়গুলোর প্রতি এবং সেগুলিকে যথাযথভাবে প্রয়োগের নিয়মাবর্তি হয়েই সেগুলোকে প্রয়োগ করা উচিত। অতএব এই সামঞ্জস্য বোধ অত্যাবশ্যক। কাব্যের এই ঔচিত্যময় বিষয়কে কেন্দ্র করে যদি কাব্য রচনা করা যায় তাহলে কাব্যসৌন্দর্য অনেকবেশি বৃদ্ধি পাবে এবং সেই কাব্য সকল সহৃদয়পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষিত হবে। কাব্যবিষয়ক এই ঔচিত্যময় চিন্তাভাবনা কাব্যকে সর্বদাই মর্যাদাপূর্ণ করে তুলে। এবং সর্বোপরি যে কাব্যে যতবেশি ঔচিত্যবিষয়ক ভাবনার প্রতিফলন প্রকাশিত হবে সেই কাব্য ততবেশি মাধুর্যময় হবে। তাই কাব্যরচনার ক্ষেত্রে এই ঔচিত্যময় বিষয়ের প্রয়োগ সম্পর্কে অবশ্যই সামঞ্জস্যবোধ অতি বাঞ্ছনীয়।

কাব্যসৌন্দর্য তথা কাব্যরচনা মাধুর্যের চিন্তাভাবনায় সুনিপুণতার সহিত শব্দবন্ধনের প্রয়োগই কাব্যের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। একজন কবির কাছে অপরিমিত শব্দভান্ডার থাকে কিন্তু সেই শব্দের ব্যবহার তথা প্রায়োগিক ক্ষেত্র যদি যথোপযুক্ত না হয় তাহলে কিন্তু কাব্য-সৌন্দর্যতার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি হয়। তাই একজন কবির নিপুণতার প্রকাশ ঘটবে তার লেখনের মধ্য দিয়ে। যে কবির শব্দচয়ন যতবেশি সুন্দর সাবলীল এবং তার সঙ্গে যথোপযুক্ত ব্যবহারিক প্রয়োগ ও যথার্থ সেই কবির কাব্যরচনা এবং তার কাব্যকৃতি ততবেশি হৃদয়গ্রাহী হয়ে ওঠে –

কিন্তু কেবলমাত্র ধ্বনি থাকিলেই কাব্য হয় না।মনোহারী শব্দ ও অর্থ ও তাহাদের বিন্যাসের চাতুর্য্য ও অলঙ্কারাদি গুণযুক্ত হইলে যদি তাহা ধ্বনিপ্রবণ হয় তবেই তাহা রসসৃষ্টির অনুকূল হয় । [৫]

তাই শুধুমাত্র রস, অলংকার,গুন ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান থাকলেই হবে না সেগুলোকে যথাযথভাবে প্রয়োগের বিষয়টাকে সমানভাবে জানা প্রয়োজন। কোন ব্যক্তি যদি তার দেহের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য নানারকম অলংকারের সংযোগ ঘটায় তাহলেই যে তার সৌন্দর্য বাড়বে তা কিন্তু নয়, কেননা তাকে সেই অলংকারগুলির প্রয়োগ বা পরিধানের বিষয় সম্পর্কে ও অবগত হতে হবে। অর্থাৎ যদি সেই ব্যক্তি তার কোমরবন্ধনরুপ অলংকার পরিধান করে আর গলায় পরিধান করার অলংকারটি যদি কোমরে পরিধান করে তাহলে কিন্তু তার সৌন্দর্যতা পাবেই না উপরন্ত হাস্যকর হয়ে উঠবে, তদ্রুপ কাব্যরচনার ক্ষেত্রে কাব্যসৌন্দর্যের জন্য যেসমস্ত বিষয়ের প্রয়োগ অত্যাবশ্যক তাদের উপযুক্ত প্রায়োগিক ক্ষেত্র বিষয়ে অবগত হতে হবে। আর যদি তা না হয় তাহলে কিন্তু সেই কাব্য কোন পাঠকের হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠবে না এবং একটা হাস্যকর হিসাবে পরিচিত হবে। তাই এই সমস্ত বিষয়ে ঔচিত্যবাদের চিন্তাভাবনা এবং তার উপযুক্তপ্রয়োগ ও বিষয়ে আমাদের সকলকে অবগত থাকতে হবে। প্রায়োগিক ক্ষেত্র যতবেশি দৃঢ় হবে ততোবেশি কাব্যসৌন্দর্য বৃদ্ধি হবে। তাই কাব্যরচনার ক্ষেত্রে ঔচিত্যবাদ এর এই প্রায়োগিক ক্ষেত্র অত্যাবশ্যক। অর্থাৎ কাব্যের প্রাণ যে ঔচিত্য তা প্রতিটি কাব্যরচনার ক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের স্মরণ রাখা উচিত। কেননা কাব্যের সালংকারাদি প্রয়োগক্ষেত্রটাই কাব্যের পরিধিও সৌন্দর্যের মাপকাঠি নির্ভর করে -

ধ্বনি না থাকিলে কোন ও রচনাকে কেবলমাত্র লেখা বলা যাইতে পারে,কাব্য বলা চলে না।ইহাও বলা চলে না যে ধ্বনি তখন একটি কমনীয়তা বিশেষমাত্র তখন তাহাকে ত অলঙ্কারের মধ্যেই গণনা করা যাইতে পারে।কারণ ধ্বনিব্যাপার বাচ্যবাচককে অতিক্রম করিয়া অন্য আর একটি বস্তু বা রসকে অভিব্যক্ত করে। [৬]

কাব্যরচনায় কাব্যের অলংকার কাব্যকে অনেকবেশি চমৎকারিত্বের দিকে ত্বরান্বিত করে। যেকাব্যে অলংকার প্রয়োগের সুনিপুণতার প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয় সেই কাব্যচমৎকারিত্বের দিক থেকে শীর্ষস্থান অধিকার করে। এই চমৎকারিত্বের কথা কেবলমাত্র যে বাংলাসাহিত্যে চর্চিত তা কিন্তু নয়, সংস্কৃত সাহিত্য এই চমৎকারিত্বের

শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করে। সাহিত্যের আকর্ষিত বিষয়ের মধ্যে যে বিষয়টা সকল সহৃদয় পাঠককে বিস্মিত আকর্ষিত করে তোলে অর্থাৎ কাব্যমুখে করে তোলে তাহলে কাব্যের অলংকার। কাব্যের এই ঔচিত্যবোধ কাব্যকে সর্বদাই প্রাণময় করে তোলে। যেকাব্য এই ঔচিত্যের ভাবধারায় প্রাণময় হয়ে ওঠে সেই কাব্যেরই চমৎকারিত্বের প্রকাশ ধরা পড়ে। অর্থাৎ যে কাব্যের মধ্যে প্রাণ আছে সেই কাব্যেরই চমৎকারিত্ব আছে। চমৎকারভিন্ন কোন কাব্যমানুষকে অতিমাত্রায় আকর্ষিত করতে পারেনা। এ বিষয়ে তাই বলতে হয়-

সাহিত্য সমালোচনা করার প্রকৃতি পর্যালোচনা করাটা যে খুব সহজ কাজ নয়, তার প্রমাণ রয়েছে সাহিত্য সমালোচনার অতি বিস্তারে। ভরতমুনির কাল থেকে আরিস্ততল, এমনকি তার ও আগে থেকে সাহিত্যে ও নাট্যের গতি-প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে, সাহিত্যের মূল্যায়ণ করার চেষ্টা হয়েছে। তারপর যতদিন গেছে আমরা দেখেছি সাহিত্যের ওপর আলোচনা বিস্তার লাভ করেছে অভাবনীয় পথে। [৭]

তাই কাব্যরচনার পাশাপাশি কাব্যটি যাতে চমৎকারিত্ব হয়ে ওঠে অর্থাৎ কাব্যের মধ্যে চমৎকারিত্বের প্রকাশ ধরা পড়ে এদিকে ও কিন্তু কাব্যিকগনের সজাগ থাকতে হয়। সংস্কৃতসাহিত্যে কাব্যচমৎকারিত্বের বিষয়ে এরকম তথ্য পাওয়া যায় যে– রমনীয় শব্দের প্রয়োগে ও কাব্যসৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ কাব্যে রমনীয় শব্দের প্রয়োগ চমৎকারিত্বের প্রকাশ ফুটে ওঠে। যদিও এই রমণীয়তা বা রমনীয় শব্দের প্রয়োগ এর ভাবধারা ঔচিত্যেরই একটা অংশ। অতএব কাব্যরচনার ক্ষেত্রে কাব্যচমৎকারিত্ব কবির এক অসামান্যকৃতি। কাব্যে এই ঔচিত্তের প্রয়োগ কাব্যকে অনেকবেশি চমৎকারিত্বের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

প্রাচীন ভারতবর্ষের অলঙ্কারবাদীরা বললেন, কাব্যে আমরা কোনো কিছু বলতে চাই নে; শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার প্রয়োগের দক্ষতা দেখাতে চাই। নীতিবাদীরা বললেন, কবির কাজ বিষয়ের সাক্ষাৎকার ঘটানো নয়, কবির আসল কাজ হলো আনন্দস্রাবী পদসংঘটনা সৃষ্টি করা, স্টাইল সর্বস্ব ক্রিয়াকলাপ দেখানো। [৮]

কাব্যরচনার ক্ষেত্রে কখনোই কোন একটা বিষয়কে এককভাবে গ্রহণ করে কাব্যকে সৌন্দরময় করে তোলা যায় না। কাব্যরচনার ক্ষেত্রে এই একক প্রয়োগের চিন্তাভাবনাকে বিসর্জন দিয়ে সমন্বয়মূলক ভাবধারাকে তার মনে স্থান দিতে হবে। কাব্যরচনার ক্ষেত্রে সমন্বয়মূলক ভাবনা একজন কবিকে অনেকবেশি কুশল করে

তোলে। কাব্য কখনোই একটা স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনা। কাব্যকে দাঁড় করাতে গেলে তার প্রয়োজন রূপ, রস ইত্যাদি। তাই কাব্যরচনায় এই সমন্বয়মূলক ভাবনা কাব্যসৃষ্টিকে আরো বেশি দৃঢ় করে তোলে। সমন্বয় এর মধ্যদিয়েই কাব্য প্রাণ ফিরে পায়। কাব্যের এই সমন্বয়তার মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হল রূপ এবং রস। যে কাব্যের বিষয় রুপ সৌন্দর্যে মহিমানিত্বে অনেকবেশি সমাদৃত সেই রচনা কাব্যজগতের এক অন্যতম দৃষ্টান্ত হয়ে রয়ে যায়। কাব্যরূপের মহিমায় কাব্য যেমন মহিমান্বিত হয়ে ওঠে তেমনি কাব্যের রসও কাব্য কি আরো বেশি জাগরিত করে তোলে। কাব্যরস কাব্যপাঠকের হৃদয়কে অনেকবেশি আকৃষ্ট করে তোলে। সংস্কৃতসাহিত্য জগতের অন্যতম আলঙ্কারিক আচার্য বিশ্বনাথ কবিরাজ তিনি রসকেই কাব্যের আত্মা বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তাই তিনি এইরকম বলেছেন যে কাব্যের মধ্যে রসময় ভাব থাকে না সেই কাব্য কখনোই কাব্য বলে পদমর্যাদা লাভ করতে পারেনা। কাব্যের রসই কাব্যকে অন্যমাত্রায় রূপ প্রদান করে। রসহীন কাব্য কখনোই কাব্য হিসেবে মর্যাদা পায়না। তাই কাব্যে কখন কোন শব্দ বা বিষয়ের প্রয়োগ ঘটিয়ে কাব্যকে রসময় করে তুলতে হবে এই বোধ বা বিবেক এবং তার ব্যবহারিক প্রয়োগের উচিত ও অনুচিতের নিদর্শন দেয় ঔচিত্য। কাব্যের এই ঔচিত্যপূর্ণ ভাবনা এবং তা কাব্যেপ্রয়োগে কাব্যের রচনাশৈলী আরোবেশি উজ্জ্বলিত করে তোলে। কোন পাঠক যদি কাব্য পাঠকরে বা শ্রবণকরে তার মধ্যে যদি কোন রস আস্বাদন করতে না পারে সেই পাঠকের হৃদয় কখনোই কিন্তু পরিতৃপ্ত হয়না। অর্থাৎ একটা নিরস কাব্য কখনোই মানবহৃদয়কে বিগলিত করতে পারেনা। মানুষের হৃদয়কে আপ্লুত করে তুলতে, উদ্বেলিত করে তুলতে, আকর্ষিত করে তুলতে ইত্যাদি বিষয়ে অবশ্যই কাব্যের মধ্যে রূপ ও রসের সমন্বয় ঘটানো অতি প্রয়োজন। অতএব এই সমন্বয়মূলক কাব্যিকবিষয় এবং তার ব্যবহারে দৃষ্টিভঙ্গিগুলো কবি যদি তার লেখনির স্পর্শে তুলে ধরার চেষ্টা করেন এবং সর্বোপরি ঔচিত্যময় ভাবনাগুলির প্রতিফলন ও তার প্রকাশ ঘটানোর সুনিপুণ কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে পাঠক সমাজের সামনে প্রস্তাবিত করেন তাহলে অবশ্যই সে কাব্য এক অন্য মাত্রায় প্রাণ ফিরে পায়। তাই কবিকে সকল সময় জাগরুক হতে হবে তার রচনা যেন অবশ্যই প্রাণময় হয়, আর এই প্রাণময়তার জন্য যে যে বিষয়ের প্রতি সজাগ থাকা অত্যাবশ্যক সেগুলোকে অবশ্যই যথোপযুক্তভাবে যথাস্থানে প্রায়োগিক হয়।সকল সমন্বয়ে কাব্য একটা কাব্য-শরীর রূপে আমাদের সামনে উপস্থিত হতেপারে, এরজন্য অবশ্যই প্রয়োজন ঔচিত্যবোধ।

কাব্যরচনায় নানান রকমের শৈলীর পরিচয় ঘটে। কিন্তু এইসকল কাব্যশৈলীর

মধ্যে বিষয়গুলি অতিপ্রয়োজন অর্থাৎ যা না হলে কাব্যকে কাব্য বলে পরিগণিত করা যায় না তাহল কাব্যের গুন এবং অলংকার। গুণহীন কাব্য কখনোই রসময় যেমন হতে পারেনা তেমনি অলংকারহীন কাব্যও কখনোই পাঠকের হৃদয়কে আনন্দ প্রদান করতে পারেনা। তাই কাব্যরচনার ক্ষেত্রে একাধারে যেমন গুন তেমনি অলংকার এই দুই সোপান কাব্যকে সর্বদাই হৃদয়গ্রাহী করে তোলে। কবির গুণপ্রসঙ্গে বিশেষ ব্যক্তি পথপ্রদর্শক হিসেবে তার মতামত ব্যক্ত করেছেন তিনি হলেন আচার্য দন্ডী। গুণ প্রস্থানের প্রধান প্রবক্তা আচার্য দন্ডী। তিনি অলঙ্কারকে বলেছেন কাব্যের শোভাবর্ধক, কিন্তু গুণকে বলেছেন কাব্যের আত্মা। দন্ডী তাঁর গ্রন্থে শ্লেষ, প্রসাদ, সমতা, মাধুর্য, অর্থব্যক্তি, ওজঃ ইত্যাদি দশটি গুণের কথা বলেছেন। তাঁরমতে, এক বা একাধিক গুণের সমাবেশেই কাব্যত্বের সৃষ্টি হয়। কাব্যরচনায় কাব্যগুণ এবং অলংকার যেমনভবে কাব্যকে জীবনদান করে তেমনিভাবে যদি কোন নিরসব্যক্তি এই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কাব্য শ্রবণপাঠ করেন তাহলে সে ব্যক্তিও সরস হয়ে যান।

'সাহিত্যের রূপ হল সমগ্রতার রূপ। ভাব ও ভাষার আত্মিক যোগসাধনে যে সমগ্রতা তাই তো সাহিত্যের উপজীব্য। সাহিত্য ও কাব্যের এই সামগ্রিক সত্তার কথা গ্রীক দার্শনিক আরিস্ততল ও আমাদের শুনিয়েছেন। এদেশে এবং ওদেশে তাঁর অনুপন্হীদের অসদ্ভাব নেই। এই সমগ্রতার মধ্যেই কাব্যের ব্যঙ্গার্থের ধারণাটুকু নিহিত। এই ব্যঙ্গার্থই 'ব্রহ্মাস্বাদ সহোদর ' মে কাব্যানন্দ তার আস্বাদন ঘটায়।'[৯] যা অলংকৃত করেতা ই অলংকার। মানুষ তার শরীরে যেমন বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অলংকার পরিধান করে দেহের সৌন্দর্যবর্ধন করে, তেমনি কাব্যসৌন্দর্যের ক্ষেত্রে ও কাব্যের অলংকার অতিগুরুত্বপূর্ণ এবং প্রাসঙ্গিক। তবে এই অলংকারকি ভাবে কখন ব্যবহৃত হবে এই পদবাচ্য নিপুণতার দায়ভার আর কারো নয়, তা ঔচিত্যের। তাহলো ঔচিত্যের। কাব্যরচনায় গুণ ও অলংকার সর্বদাই কাব্যিক স্ফুরণকে বাড়িয়ে তোলে। তাই এই কাব্যিক গুণের স্ফুরণে গুণ ও অলংকার কাব্যকে অনেকবেশি উদ্দীপিত করে তোল।

কবির কৃতি কাব্য। কবির কাব্যরচনা কখনোই কোন একক গুন বা বৈশিষ্ট্যকে আশ্রয় করে রচিত হতে পারে না। কাব্যরচনায় অবশ্যই সংহতির প্রয়োজন। এই সংহতি বলতে নির্দিষ্ট করে কয়েকটি গুণ বা বৈশিষ্ট্য নাম উল্লেখের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করা যায় না।তবে বিশেষত কাব্যরচনায় যে সম্মতির প্রয়োজন তাহল শব্দচয়ন, বাক্যগঠন, কাব্যেরগুন, অলংকার, রসপ্রভৃতি।এই সকল বিষয়ের সংহতির ফলে

কাব্যের সৌন্দর্য এবং সর্বোপরি কাব্য প্রাণময় হয়ে ওঠে। হয়তো এই সংহতি প্রকৃত অর্থে কাব্যকে অনেকবেশি প্রাণময় করে তোলে। কাব্যের এই বিষয়গুলির মধ্যে সমন্বয় সাধিত করে তার ব্যবহারিক প্রয়োগের যে সুন্দর ঔচিত্যপূর্ণ ভাবনাময় ধারাবাহিকতা কবির মননে, চিন্তনে বায়ুর ন্যায় প্রবাহিত হয়ে যখন লেখনির স্পর্শে তার রূপ প্রকাশিত হয় তখনই প্রকৃত কাব্য বলে বিবেচ্য হয়। তাই এই সমন্বয়পূর্ণ চিন্তাধারাই কাব্যকে অনেকবেশি সাবলীল করে তোলে। কাব্যরচনায় এই সংহতিময় চিন্তাভাবনা অবশ্যই কর্তব্য এবং এর মাধ্যম দিয়েই কাব্য একটা অন্য নতুন মাত্রা লাভ করে ও সর্বোপরি এক নতুন সৌরভময় বার্তা প্রদান করে।

কবির কবিপ্রতিভা থেকেই ঔচিত্যের সৃষ্টি। উচিত এবং অনুচিতের বোধই হল ঔচিত্য। ঔচিত্যের ভাবনায় কাব্যশাস্ত্রের দিকদর্শন এক অন্যমাত্রা লাভ করে। এইঔচিত্য কাব্যরচনার ক্ষেত্রে শব্দপ্রয়োগে বোধ, বাক্যগঠনের বোধ, রসময়তার বোধ, অলংকারপ্রয়োগের বোধ ইত্যাদি বিষয়ে যে সুন্দর জ্ঞান জাগরিত হয় এবং সর্বোপরি কাব্যকে কাব্যরূপে পরিচিত ঘটায় এককথায় অনবদ্য।ঔচিত্য কেবলমাত্র কাব্যসৌন্দর্য ঘটায়না, এই ঔচিত্য সামঞ্জস্যবোধর জাগরণ ঘটায়, তবে এ সামঞ্জস্য কাব্য সামঞ্জস্য, কাব্যশৈলীর ব্যবহারিক সামঞ্জস্য। ঔচিত্যের চিন্তাধারাই কাব্যকে রূপ, রস, অলংকারাদিতে চমৎকারিত্ব করে তোলে। কাব্যে ঔচিত্যভাবনা কাব্যশাস্ত্রকে অনেকবেশি সুস্পষ্ট করে তোলে।

সহায়ক গ্রন্থসূচী:

১.ভট্টাচার্য, বিষ্ণুপদ, *সাহিত্য-মীমাংসা* বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা, ১৩৫৫ (পৃ ১৪)
২.পূর্বোক্ত (পৃ ১৮)
৩.পূর্বোক্ত (পৃ ২৩)
৪. দাশগুপ্ত, সুরেন্দ্রনাথ, *কাব্যবিচার* , মিত্র এন্ড ঘোষ, কলকাতা, ১৩৩৯ (পৃ ১৮১)
৫. পূর্বোক্ত (পৃ ১৮৭)
৬. পূর্বোক্ত (পৃ ১৯০)
৭. নন্দী, সুধীরকুমার, *নন্দনতত্ত্ব* , পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ (পৃ ১৫০)
৮. পূর্বোক্ত (পৃ ১৫০)
৯. পূর্বোক্ত (পৃ ১৬২)